প্রথম অধ্যায়

এলাম আমরা কোথা থেকে?

লেখকের কৈফিয়তের পর...

ইন্দোনেশিয়ার ছোট্ট দ্বীপ *ফ্লোরস* (Flores)। এখানকার অধিবাসীরা অন্যান্য সব জাতির মতই কাজ করে, খায় দায়, ফুর্তি করে আর অবসর সময়ে গল্পগুজব করে। এখানকার বুড়োবুড়িরা আমাদের দাদী-নানীদের মতই 'ঠাকুরমার ঝুলি' সাজিয়ে বসে নাতি-নাতনীদের কাছে - হাজার বছরের মুখে মুখে চলে আসা উপকথাগুলোকে বলে যায় তাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে। কিন্তু এদের ঠাকুরমার ঝুলিগুলো যেন কেমনতর অদ্ভুত! লালকমল-নীলকমল আর দেও-দৈত্য নেই ওতে, আছে কতকগুলো ক্ষুদে বামনদের গল্প। মাত্র এক মিটারের মত লম্বা বেটে লিলিপুটের মত একধরনের মানুষ অনেক অনেকদিন আগে তাদেরই আশে পাশে নাকি বাস করতো, যা সামনে পেতো তাই মুখে দিতো, তাদের ফসল নষ্ট করতো, নিজেদের মধ্যে ফিস ফিস করে কথা বলতো আর যা শুনতো তাই নাকি নকল করার চেষ্টা করতো। এমনি একজন ক্ষুদে বামনের নাম ছিল *এবু গোগো* (এবু মানে নানী আর গোগো মানে এমন কেউ যে যা সামনে পায় তাই খায়), তাকে খেতে দিলে সে খাওয়ার বাসনটা পর্যন্ত খেয়ে ফেলতো, সুযোগ পেলে নাকি মানুষের মাংসও খেতে দ্বিধা করতো না[১] ......

দ্বীপবাসীদের বলা গল্পগুলো শুনলে মনে হয় যেনো এই সেদিনই তারা সবাই একসাথে বসবাস করতো। নিছক রূপকথা ভেবেই বেঁটে-বাটুলদের গল্পগুলো সবাই উড়িয়ে দিয়েছিলো এতদিন। অবাক এক কান্ড ঘটলো ২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে। বিজ্ঞানীরা *ফ্লোরস* দ্বীপেরই মাটি খুড়ে পেলেন এক মিটার লম্বা এক মানুষের ফসিল-কঙ্কাল; প্রথমে সবাই ভেবেছিলো হয়তো কোন বাচ্চার ফসিল হবে বুঝি এটা। কিন্তু তারপর ঠিক ওটারই কাছাকাছি জায়গায়ই পাওয়া গেলো আরও ছয়টি একই রকমের অর্ধ-ফসিলের কঙ্কাল। বিজ্ঞানীরা আরও পরীক্ষা করে বুঝলেন এগুলো আসলে পূর্ণাংগ মানুষেরই কঙ্কাল, কার্বন ডেটিং থেকে পাওয়া তথ্যানুযায়ী জানা গেলো, মানুষের এই নব্য আবিষ্কৃত প্রজাতিটি (প্রজাতি হল এমন কিছু জীবের সমষ্টি যারা শুধু নিজেদের মধ্যে প্রজননে সক্ষম, যেমন ধরুন আমরা অর্থাৎ আধুনিক মানুষ বা *Homo sapiens* একটি প্রজাতি যারা আর কোন প্রজাতির জীবের সাথে প্রজননে অক্ষম - আরও অন্যান্য প্রজাতির মানুষের ফসিল পাওয়া গেলেও আমরা একটাই প্রজাতি যারা এখনও টিকে আছি) মাত্র ১২,০০০-১৪,০০০ বছর আগেই এই দ্বীপটিতে বসবাস করতো। ১২,০০০ বছর আগে এই দ্বীপে এক ভয়াবহ অগ্নুৎপাত ঘটে, বিজ্ঞানীরা মনে করছেন হয়তো দ্বীপের অন্যান্য অনেক প্রাণীর সাথে এরাও সে সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো। বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা গেছে যে তারা আমাদের *হোমিনিড* (মানুষ এবং নরবানর বা *ape man* কে *Hominid* গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ধরা হয়) গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের চোয়াল এবং মস্তিষ্কের মাপ আমাদের মত আধুনিক মানুষের মত নয়। উচ্চতায় মাত্র ১ মিটার কিন্তু হাতগুলো অপেক্ষাকৃতভাবে বেশ লম্বাটে যা থেকে মনে হয় তারা তখনও অনেকটা সময় হয়তো গাছে গাছেই কাটাতো। তাদের মাথার মাপ আবার খুবই ছোট - মাত্র ৩৮০ সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার), যেখানে আমাদের বা আধুনিক মানুষের মস্তিষ্কের মাপ হচ্ছে গড়ে প্রায় ১৩৩০ সিসি। এত ছোট মগজ নিয়ে আধুনিক মানুষের মত অস্ত্র বানিয়ে শিকার করে খাবার সংগ্রহের মত বুদ্ধি কি ছিলো তাদের, নাকি গাছের ডালে ঝুলে ঝুলেই তারা সময় কাটাতো বানর আর শিম্পাঞ্জিদের মত? এই প্রশ্নেরও উত্তর মিললো যখন তাদের ফসিলের পাশে ১২,০০০-৯৫,০০০ বছরের পুরনো বেশ কিছু পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেল যা কিনা

শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীর পক্ষেই বানানো সম্ভব।

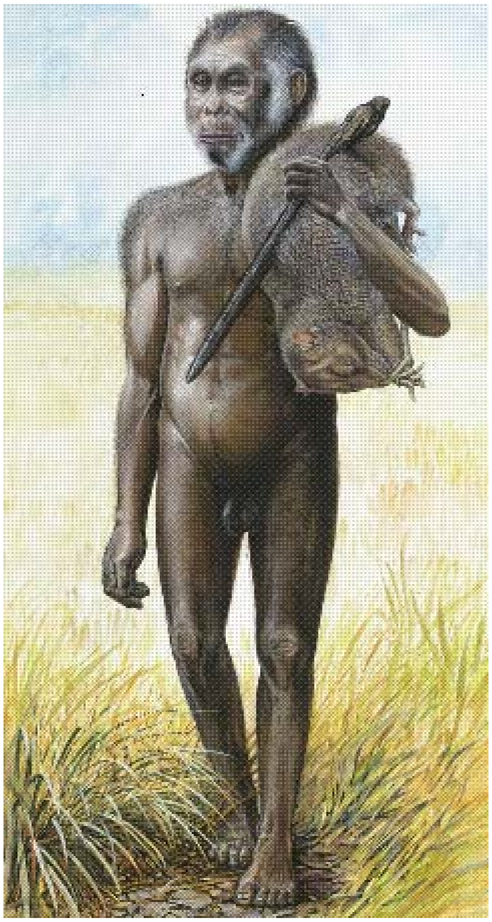

চিত্র ১.১ : বামন মানুষের সম্ভাব্য প্রতিকৃতি
(সৌজন্য : National Geographic journal, April 2005)

বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন সম্ভবত অনেক আগেই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া মানুষের আরেকটি প্রজাতি *Homo erectus* এর একটি দল এই দ্বীপে এসে বসবাস করতে শুরু করে। হাজার হাজার বছর ধরে অত্যন্ত ছোট এই দ্বীপটিতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করার ফলে তারা বিবর্তিত হতে হতে একসময় ভিন্ন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। তাদের ফসিলের আশে পাশে এক ধরনের বামন হাতি এবং *কমডো ড্রাগন* সহ অন্যান্য বেশ কিছু প্রাণীর ফসিলও পাওয়া গেছে[২]।

এই নব্য আবিস্কৃত ক্ষুদে বামনগুলো (Hobbit) বিজ্ঞানীদেরকে বেশ অবাক করেছে। এদের কারণে মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নিয়ে তারা আবার নতুন করে ভাবতে বাধ্য হচ্ছেন । এই যে এতদিন ধরে আমরা ভেবে এসেছি যে সাম্প্রতিক কালে আমরা ছাড়া মানুষের আর কোন প্রজাতি পৃথিবীতে ছিল না - সেটা তো আর তাহলে সত্যি নয়। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যাওয়া নিয়ান্ডারথালদের (Neanderthal) ফসিল দেখে প্রথমে বিজ্ঞানীরা তাদেরকে আমাদের একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত

করেছিলেন, কিন্তু তারপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিশেষ করে ডিএনএ (DNA)র পরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা একমত হয়েছেন যে তারাও আসলে আমাদের *Homo sapiens* প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত নয় [৩]। প্রায় ১৫০ থেকে ৩০ হাজার বছর আগে পর্যন্ত তারা একটি ভিন্ন প্রজাতি হিসেবে বিচরণ করেছে পৃথিবীর বুকে। হয়তো আমাদের পূর্বপুরুষেরাই ইউরোপ দখল করে নেওয়ার সময় তাদেরকে বিলুপ্ত হয়ে যেতে বাধ্য করেছিলো। কিন্তু সে তো হল ৩০-৪০ হাজার বছর আগের কথা, তারপর তো মানুষের আর কোন প্রজাতির সাথে আমাদেরকে এই পৃথিবী ভাগ করে নিতে হয়নি! কিন্তু এই বামন মানুষদের এতো সাম্প্রতিক কালে টিকে থাকার প্রমাণ মেলার পর বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু করেছেন তাহলে হয়তো আরও কাছাকাছি সময়েও মানুষের একাধিক প্রজাতি টিকে ছিলো [৩]। বানর, বিড়াল, কুকুর বা অন্যান্য প্রাণীর মত মানুষেরও আরও প্রজাতি ছিলো, ভাবতেও অবাক লাগে এই পৃথিবীর বুকে প্রায় আমাদের মতই দেখতে একাধিক প্রাণী হেটে বেড়িয়েছে একই সাথে। শুধু তাই তো নয়, জীববিজ্ঞান, অনুজীববিজ্ঞান সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অভুতপুর্ব উন্নতির ফলে বিজ্ঞানীরা মানুষের পূর্বসুরী প্রজাতিগুলোকেও সনাক্ত করতে পেরেছেন, তারা আজকে সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণ করতে পেরেছেন যে এক ধরনের নর বানর বা এপ থেকে আসলে মানুষের বিবর্তন ঘটেছে, এদের সাথে আমাদের *ডি.এন.এ*র প্রায় ৯৮.৬% মিল রয়েছে।

এ তো গেলো আমদের নিজেদের কথা, এবার চোখ ফিরানো যাক আমাদের প্রিয় বাসভুমির দিকে। আমাদের মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছিল প্রায় ১৩-১৫ শ কোটি বছর আগে, আর পৃথিবীসহ আমাদের সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি ঘটে সাড়ে চারশ কোটি বছর আগে। তারপর আরও একশ কোটি বছর লেগেছে আমাদের পৃথিবী নামক গ্রহটির মহাপ্রলয়ঙ্করী উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মত অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে প্রাণের উৎপত্তির জন্য উপযুক্ত একটা পরিবেশ তৈরী করতে। এখন পর্যন্ত পাওয়া সব বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য প্রমাণ অনুযায়ী বলা যায় পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি হতে শুরু করেছে প্রায় সাড়ে তিনশ কোটি বছর আগে। আমরা আজকে আমাদের চারপাশে প্রাণ বলতে যা বুঝি বা দেখি তার সাথে সেই আদিমতম প্রাণের কিন্তু কোন মিলই ছিল না - প্রাণ বলতে ছিল অতি সরল আনুবীক্ষণিক এবং আদিম একধরনের অকোষীয় জীবন। গঠনের দিক থেকে এরা আজকের দিনের ব্যাকটেরিয়ার থেকেও অনেক বেশী সাধারণ এবং সরল। দেখতে যেমনই বা যত আনুবীক্ষনিকই হোক না কেন এদেরকে জীবন্ত বলে স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই! এরা তো জীবের মৌলিক দুটো বৈশিষ্ট্যই ধারণ করে যা কোন জড় পদার্থের মধ্যে থাকা সম্ভব নয় - এরা একদিকে যেমন বাইরের পরিবেশ থেকে সক্রিয়ভাবে শক্তি সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে, বড় হয় এবং বদলায়, তেমনিভাবে আবার বংশবৃদ্ধি করে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধিও করতে পারে। আর সাড়ে তিন'শ কোটি বছর আগে এই আদিম এবং সরলতম জীবগুলো থেকেই শুরু প্রাণের বিকাশ এবং বির্বতনের ইতিহাস। কোটি কোটি বছর ধরে ঘটে আসা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই সরলতম এক কোষী প্রাণ থেকেই উদ্ভব ঘটেছে আমাদের চারপাশের মানুষ সহ অন্যান্য সব জীবের।

বিবর্তনের এই দীর্ঘ ইতিহাসের বইয়ের কোন পাতায় তাহলে মানুষের দেখা মিললো? এক্কেবারে শেষের দিকের পাতায় এসে আমরা খুঁজে পাই মানুষ নামের আমাদের এই আধুনিক প্রজাতিটির এবং তার পূর্বপুরুষদের সন্ধান। ৪০-৮০ লাখ বছর আগে এক ধরনের বানর প্রজাতি দুই পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখলেও তার থেকে আমাদের অর্থাৎ আধুনিক মানুষের উদ্ভব ঘটেছে মাত্র এক লাখ বছর আগে। ভূতাত্ত্বিক নিয়মে হিসাব করলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বের ব্যাপারটা এক্কেবারে আনকোরা। ধরা যাক, পৃথিবীর বয়স একদিন বা ২৪ ঘন্টা, তা হলে মানুষ নামের এই তথাকথিত 'সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টিটির' জন্ম

হয়েছে ২৪ ঘন্টা ফুরানোর মাত্র কয়েক সেকেন্ড আগে!

তাহলে এখন স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন আসে, এই যে ছোটবেলা থেকে আমাদের মুরুব্বী, প্রচারযন্ত্র, ধর্ম্প্রতিষ্ঠানগুলো মানুষের উৎপত্তি নিয়ে যে সব গাল-গপ্প শিখিয়ে এলো তার সাথে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত আমাদের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের তত্ত্বের কোন মিল নেই কেনো? কারণ, ক'দিন আগেও মহাবিশ্ব বা প্রাণের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছে তা বোঝার জন্য যে বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ প্রয়োজন তা মানুষের জানা ছিলো না, ছিল না কোটি কোটি বছরের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। কিন্তু নিজের 'সৃষ্টি-রহস্য' নিয়ে কৌতুহলের তো কোন অন্ত ছিল না সেই সময়ের আদি থেকেই। তাই এই 'সৃষ্টি-রহস্য' নিয়ে প্রত্যেক জাতির মধ্যে সেই প্রাচীন কাল থেকেই রচনা করা হয়েছে নানা ধরনের কল্প-কাহিনী, ইংরেজীতে যেগুলোকে বলে 'myth'। ধর্মগ্রন্থগুলোসহ বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতাগুলো প্রত্যেকে তাদের তদানীন্তন স্থানীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস, সময় এবং জ্ঞানের স্তর অনুযায়ী একেক ধরনের গল্পের অবতারণা করেছে। হিন্দু পুরাণ বলছে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধকারময় ছিল, তখন বিরাট মহাপুরুষ পরম ব্রহ্ম নিজের তেজে সেই অন্ধকার দূর করে জলের সৃষ্টি করেন, সেই জলে সৃষ্টির বীজ নিক্ষিপ্ত হয়। তখন ওই বীজ সুবর্ণময় অন্ডে পরিণত হয়। অন্ড মধ্যে ওই বিরাট মহাপুরুষ স্বয়ং ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান নিতে থেকেন। তার পর ওটিকে বিভক্ত করে আকাশ ও ভূমন্ডল আর পরবর্তীতে প্রাণ সৃষ্টি করেন। বাইবেল এবং কোরাণ বলছে, সৃষ্টিকর্তা ছয় দিনে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরী করেছিলেন। বাইবেলের (জেনেসিস) ধারণা অনুযায়ী ছয়দিনের প্রথম দিনটিতেই ঈশ্বর আমাদের এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেন। এর তিনদিন পর তিনি সূর্য, চন্দ্র আর তারকারাজির সৃষ্টি করেন - আর এ সব কিছুই তিনি তৈরী করেছিলেন মাত্র ছ'হাজার বছর আগে। আবার প্রাচীন চৈনিক একটি কাহিনী থেকে আমরা জানতে পারি, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির শুরুতে একটা কালো ডিমের মত ছিল। *প্যান গু* নামের একজন দেবতা তাঁর কুড়ালের কোপে ডিমটিকে দ্বিখন্ডিত করেন এবং মহাবিশ্বকে প্রসারিত হবার সুযোগ করে দেন। প্যান গুর শরীরের মাছি আর উকুন থেকেই নাকি পরবর্তীতে মানব সভ্যতার জন্ম হয়েছে। আবার অ্যাপাচি মিথ অনুযায়ী, সৃষ্টির শুরুতে আসলে কিছুই ছিল না - না ছিল এই পৃথিবী, আকাশ কিংবা কোন সূর্য -চন্দ্র-তারা। এই তমসাচ্ছন্ন নিকষ অন্ধকার থেকে হঠাৎ করেই একটি পাতলা চাকতির অভ্যুদয় ঘটে, যেখানে আসীন ছিলেন এক 'দাঁড়ি ওয়ালা ভদ্রলোক' - যিনি এ জগতের মালিক, আমাদের বিশ্বপিতা! তিনিই নিজের ইচ্ছায় জগৎ থেকে শুরু করে প্রাণ পর্যন্ত সব কিছুই সৃষ্টি করেন ......মানুষের উৎপত্তি নিয়ে এমনতর হাজারো গল্পের সন্ধান পাওয়া যায় বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতায় এবং ধর্মগ্রন্থে [৯]।

আসলে আঠারো শতকের শেষভাগ থেকেই মানুষ বুঝতে শুরু করে এই কল্পকাহিনীগুলো নিয়ে পড়ে থাকলে আর চলবে না, কারণ বৈজ্ঞানিকভাবে পাওয়া তথ্য-প্রমাণগুলো ইতিমধ্যেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে শুরু করেছে যে, মহাবিশ্বের অন্য সব কিছুর মতই আমাদের এই পৃথিবীও ক্রমাগতভাবে পরিবর্তিত হতে হতে অবশেষে আজকের জায়গায় এসে পৌছেছে। এই কোটি কোটি বছরের ইতিহাস হচ্ছে ছোট, বড়, ধীর, ক্রমাগত থেকে শুরু করে অত্যন্ত নাটকীয় এবং অকস্মাৎভাবে ঘটা পরিবর্তন, বিকাশ আর বিবর্তনের ইতিহাস, যা আসলে আজও আমাদের চারপাশে ঘটে চলেছে অনবরত। পৃথিবীর মাটির বিভিন্ন স্তরে জমে থাকা বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদের ফসিল থেকে আমরা এই পরিবর্তনের নিদর্শন দেখতে পাই। জীবের *ডিএনএ* বিশ্লেষণ করেও পাওয়া যাচ্ছে একই তথ্য। মানুষসহ পৃথিবীতে অন্যান্য প্রাণের উৎপত্তি, অস্তিত্ব, টিকে থাকার ইতিহাস বুঝতে হলে এই সুদীর্ঘ পরিবর্তনের ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিকভাবে

বুঝতে হবে; অজ্ঞতা, কুসংস্কার, প্রাচীন এবং অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করতে শিখতে হবে।

বিবর্তন নিয়ে এতো মাথাব্যথা কেন?

কিন্তু এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কেনোই বা আমাদের বিবর্তন সম্পর্কে জানতে হবে, এর খুঁটিনাটি বুঝতে হবে? দিব্যি তো দিন চলে যাচ্ছে এসব তত্ত্বকথা না জেনেই। একটু খেয়াল করে আশেপাশে তাকালেই দেখা যাবে যে, বিবর্তনের তত্ত্ব ছাড়া আজকে আমাদের চারপাশের অনেক কিছুই ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না, অনেক সহজ প্রশ্নের উত্তর মিলছে না। যেমন ধরুন, ডাক্তাররা কেনো বারবার করে রোগীকে তার অ্যান্টিবায়োটিকের পুড়ো ডোজটা শেষ করতে বলে দেন? আমাদের সাথে ঐ বেচারী ইঁদুরগুলোর কিইবা মিল রয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা মানুষের উপর নতুন কোন ওষুধ প্রয়োগ করার আগে তাদের উপর পরীক্ষা করে নেন? কিংবা আমাদের চারপাশে এত্ত ধরনের প্রাণের সামহার কেনো, তাদের দরকারটাই বা কি ছিলো? পৃথিবীর একেক জায়গায় কেনো একেক রকমের প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়? আমরাই বা এলাম কোথা থেকে? কেনো একেক জায়গার মানুষ দেখতে একেক রকম হল?.......

বিবর্তনবাদ তত্ত্বের মাধ্যমে আজকে আমরা আমাদের চারপাশের জীবন এবং প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি। আমাদের চারপাশের জীবের মধ্যে এত বৈচিত্র দেখা যায় কেনো, এমনকি একটা মানুষের সাথে আরেকটা মানুষের কেনো এত পার্থক্য? বেঁচে থাকার প্রয়োজনেই আসলে প্রকৃতিতে একেকটা জীবের একেক রকম বৈশিষ্ট্যের বিবর্তন ঘটে, এর ফলশ্রুতিতেই তারা একেকজন একেক পরিবেশে খাপ খাইয়ে নিয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে খাবার এবং শক্তি জোগার করে টিকে থাকতে সক্ষম হয়। যেমন- মানুষের কথাই ধরা যাক, সব মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদের মধ্যে পার্থক্যের কোন শেষ নেই। একেক এলাকার মানুষের মধ্যে একেরকমের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী যে পার্থক্যটা চোখে পড়ে তা হচ্ছে মানুষের গায়ের রং। কালো রং এর গায়ের মানুষের সূর্যের তাপ থেকে নিজের চামড়াকে রক্ষা করার ক্ষমতা অনেক বেশী থাকে। তাই আমরা সাধারণভাবে দেখতে পাই যে, শীতের দেশের মানুষের চামড়া অনেক বেশী সাদা আর গরম দেশের মানুষের গায়ের রং কালো হয়। অবশ্য ইতিহাসের পরিক্রমায় মানুষ তার জীবন আর জীবিকার তাগিদে এতবার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে যে এখন সব জায়গায় এই পার্থক্য আর এত সুক্ষ্মভাবে নাও দেখা যেতে পারে। ব্রিটিশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী চার্লস ডারউইন যে বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে (Finch) দেখে খুব অবাক হয়েছিলেন তাদের কথাই ধরি। গ্যালাপ্যাগাস দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন দ্বীপে তিনি বিভিন্ন রকমের ঠোঁটওয়ালা ফিঙ্গে দেখতে পান, ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, সময়ের সাথে সাথে খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদের ঠোটের আকারও বদলে গেছে। অতীতে এক সময় সব রকমের ফিঙ্গেই একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো, সময়ের সাথে সাথে বিবর্তনের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এরকম ১৪ ধরনের ফিঙ্গের প্রজাতি খুঁজে পেয়েছেন।

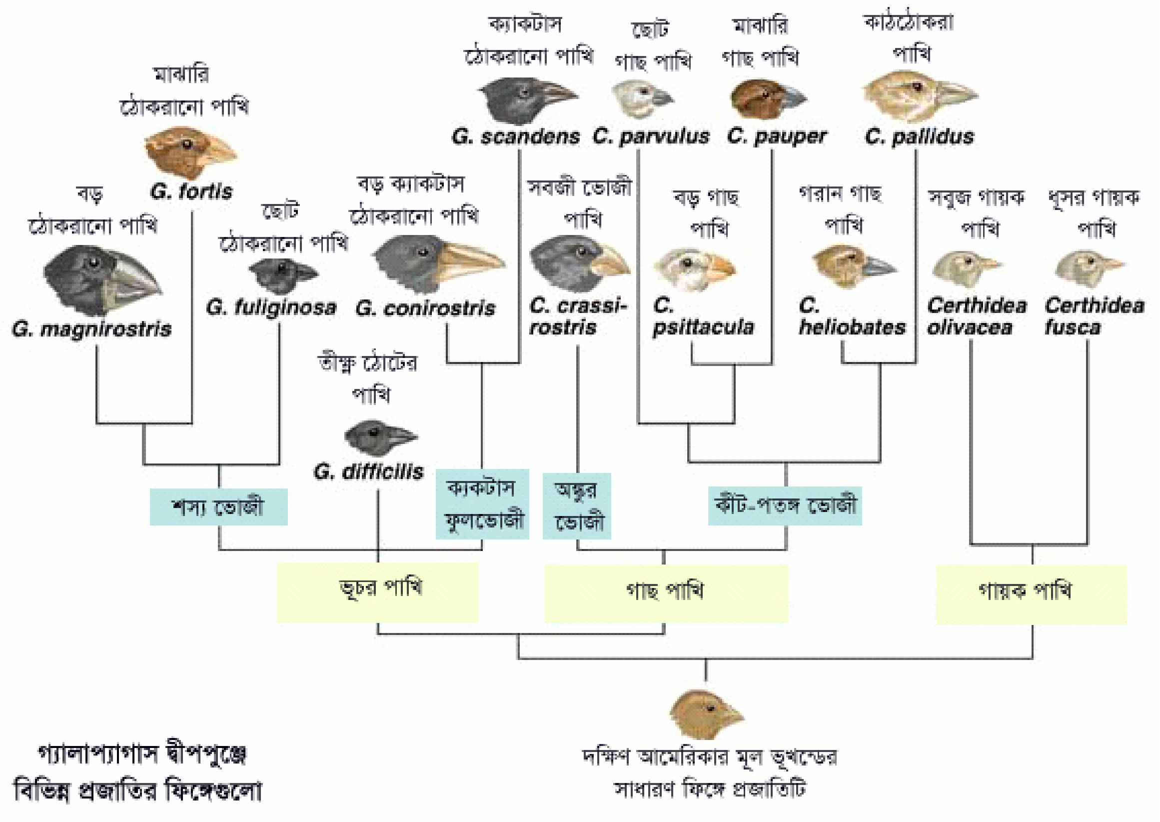

চিত্র ১.২: ঠোটের গঠনের সাথে বিভিন্ন প্রজাতির ফিঙ্গে পাখির আহার্য্য দ্রব্যের সম্পর্ক
www.cox.miami.edu থেকে নেওয়া

আবার ঠিক উলটোভাবে দেখা যায় যে বিভিন্ন প্রাণীর বৈশিষ্ট্য এবং জিনের গঠনের মধ্যে অকল্পনীয় রকমের মিল দেখা যাচ্ছে [৪]। যেমন ধরুন, মানুষের হাতের হাড় আর এত অন্যরকম দেখতে একটা তিমি মাছের সামনের পাখার হাড় প্রায় একইরকম। আবার, জন্মপূর্ববর্তি ভ্রূণাবস্থায় বিভিন্ন প্রাণীর বাচ্চাদের দেখতে আনেকটা একইরকম দেখায়। শিম্পাঞ্জীদের সাথে আমাদের ডি এন এ প্রায় ৯৮.৬%, ওরাং ওটাং এর সাথে ৯৭ % [৫], আর ইঁদুরের সাথে ৮৫% [৬] মিলে যাচ্ছে। এ কারণেই ইঁদুর বা অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে বিভিন্ন ওষুধের বা চিকিৎসার প্রাথমিক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়ে তা পরবর্তীতে আবার মানুষের দেখে প্রয়োগ করা সম্ভব হয়। আর এসব সাদৃশ্যের পিছনে কারণ একটাই, পৃথিবীর সব প্রাণীই একই আদি জীব বা পূর্বপুরুষ থেকে কোটি কোটি বছরের বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপত্তি হয়েছে। যে জীব যত পরে আরেক জীব থেকে বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতি বা জীবে পরিণত হয়েছে তার সাথে ঐ জীবের ততই বেশী মিল খুজে পাওয়া যায়।

বিবর্তনের প্রক্রিয়া থেকে আমরা চারপাশের পরিবেশ, প্রকৃতি এবং তার গঠন সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণাও পাই। বিবর্তনের মাধ্যমে যেমন অহরহ জীবের পরিবর্তন ঘটছে আবার তারই ফলশ্রুতিতে পরিবর্তন ঘটে চলেছে আমাদের পারিপার্শ্বিকতারও। এর একটা মজার উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর বাতাসে

অক্সিজেনের আবির্ভাব। আমাদের তো উদ্ভবই ঘটতো না বাতাসে অক্সিজেন না থাকলে! অবাক লাগে ভাবতে যে আদি পৃথিবীর বাতাসে মুক্ত অক্সিজেনের কোন অস্তিতই্ব ছিলো না। প্রায় আড়াইশো কোটি বছর আগে সালোক সংশ্লেষণকারি (photo sysnthetic) উদ্ভিদের বিবর্তন ঘটে যারা পরিবেশ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং পানি গ্রহন করে খাদ্য তৈরী করতে শুরু করে এবং বিনিময়ে পরিবেশে মুক্ত অক্সিজেন ছেড়ে দিতে শুরু করে। তার ফলেই আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের আবির্ভাব ঘটতে শুরু করে। এই যে আমরা আমাদের চারপাশে মানুষসহ অক্সিজেন গ্রহণকারী সব প্রাণী দেখছি, তাদের সবারই বিবর্তন ঘটেছে বায়ুমন্ডলে অক্সিজেন ছড়িয়ে পরার পর।

জীবের বিবর্তন না বুঝলে আজকে চিকিৎসাবিদ্যা, কৃষিবিদ্যার বিভিন্ন আবিষ্কার অসম্ভব হয়ে দাঁড়াতো। বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসগুলো কিভাবে ওষুধ প্রয়োগের সাথে সাথে বিবর্তিত হয়ে আরও শক্তিশালী এবং পরিবর্তিত রূপ ধারণ করতে পারে তা না বুঝলে আজকে ওষুধ কোম্পানীগুলোকে ঠিক অসুখের জন্য ঠিক ওষুধটা তৈরী করাই বন্ধ করে দিতে হবে। আজকে ডাক্তাররা অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ প্রয়োগ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন, কারণ আমাদের শরীরে রোগ সারাতে যত বেশী অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হচ্ছে ততই ব্যাকটেরিয়াগুলো তাতে খাপ খাইয়ে নিয়ে পরিবর্তিত হতে হতে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। একই ব্যাপার ঘটতে দেখা যায় জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার সময়েও। কদিন আগে আমেরিকার একটা স্টেটের পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, ইদানীং কালে সেখানকার হাসপাতালগুলো থেকেই অনেক বেশী রোগী জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, অর্থাৎ তারা আসে এক রোগের চিকিৎসা করাতে আর ঘরে ফিরে যায় হাসপাতাল থেকে পাওয়া অন্য রোগের জীবাণু শরীরে নিয়ে। এর থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার রোগী মারাও যাচ্ছে। ব্যাকটেরিয়াগুলো প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকে অভ্যস্ত হয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে নিজেদেরকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে, আর তার ফলে হাসপাতালগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে অসংখ্য শক্তিশালী জীবাণু যাদেরকে নিরোধ করতে ডাক্তাররা হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন।

বিবর্তনের ধারনা জানার এবং বোঝার আরেকটি গুরুত্বপুর্ণ কারণ রয়েছে। বিবর্তনবাদ আমাদের সময়ের এমনই একটি শক্তিশালী তত্ত্ব যে এর বিস্তৃতি শুধু বৈজ্ঞানিক বা টেকনিকাল জগতেই নয় বরং সামাজিকভাবেও এর গুরুত্ত্ব অপরিসীম। সমাজের বেশীর ভাগ মানুষ, বিশেষ করে রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অংশ, এর কথা শুনলেই আঁতকে ওঠেন, কারণ এটা আমাদের প্রচলিত পুরানো, অবৈজ্ঞানিক এবং ধর্মীয় ধারণাগুলোকে সমর্থন করে না। বিবর্তনবাদকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শেখার মাধ্যমে আমরা নিজেরা যেমন আমাদের চারদিকের প্রকৃতি এবং পরিবেশকে বৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করতে শিখবো, তেমনিভাবে বুঝতে এবং অন্যদেরকে বুঝাতে পারবো বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং সমাজে হাজার হাজার বছর ধরে টিকে থাকা বহু স্থবির চিন্তাধারার মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়। বিবর্তনবাদ বলে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত বিবর্তিত হচ্ছে, পরিবর্তনই জগতের মূল নিয়ম, নতুনকে, পরিবর্তনকে সাদরে অভ্যর্থনা জানানোই প্রকৃতির রীতি। সব কিছুই ঘটছে আমাদের চোখেরই সামনে কখনো খুবই ধীরে, কখনও বা আকস্মিকভাবে খুব দ্রুত গতিতে। পরিবর্তন ঘটছেই; বাইরের কোন ঐশ্বরিক শক্তি এসে যেমন আমাদের কোন কিছু বদলে দিয়ে যাচ্ছে না, তেমনি পরলৌকিক পুরষ্কারের জন্যও হা-পিত্যেশ করে বসে থাকার কোন কারণ নেই। দর্শনের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমরা আসলে নিজেদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংগ্রামের মাধ্যমেই পরিবর্তিত হতে হতে প্রতিনিয়ত এগিয়ে চলেছি সামনের দিকে।

তাই এই বিবর্তন তত্ত্বকে বিজ্ঞানের ইতিহাসে গুটিকয়েক যে বড় বড় ঘটনা ঘটেছে তার একটি বলে ধরে নেওয়া হয়। পদার্থবিদ ভিকটর স্টেঙ্গার যেমন বলেছেন,

> ‘ ..... তবে গত পাঁচ শতাব্দীতে অন্ততপক্ষে দুটি বৈজ্ঞানিক আবিস্কারকে বড় paradigm shift হিসাবে চিহ্নিত করা যায় ; (১) ষোড়শ শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের আবিস্কৃত সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব- পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং (২) উনবিংশ শতাব্দীতে (১৮৫৯ সাল) চার্লস ডারউইন এবং অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের প্রস্তাবিত তত্ত্ব - প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মাধ্যমে জীবজগতের বিবর্তন। এই দুটি আবিস্কার শুধু যে মানুষের চিন্তাধারাকে এক নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করেছিল তাই নয়, সেগুলো তখনকার প্রাচীন এবং গভীরভাবে সুরক্ষিত চিন্তাপদ্ধতিকে সরিয়ে দিয়ে পুরানো ধারণাগুলোর উপরও আধিপত্যও বিস্তার করে নিয়েছিল। এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, তত্ত্ব দুটোই পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রাচীন চিন্তাগুলোকে অত্যন্ত প্রবলভাবে আঘাত করেছিলো - যে গুলোকে মানুষ এতদিন ধরে সৃষ্টিকর্তার অভ্রান্ত বাণী হিসেবে বিশ্বাস করতো [৭]।’

চার্লস ডারউইনের প্রস্তাবিত এই বিবর্তন তত্ত্বে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ রয়েছে, সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স সুন্দরভাবে অল্প কথায় বর্ণনা করেছেন জীববিজ্ঞানের এই মূল দুটি তত্ত্বকে,

> *জীববিজ্ঞানে ডারউইনের মূল অবদান একটি নয় দুটো, আর এই দুটো বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা ছাড়া বিবর্তনবাদ বোঝা সম্ভব নয়। তিনিই প্রথম পর্যাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমানের মাধ্যমে প্রমান করে দেখান যে, জীবজগৎ স্থিতিশীল নয় - বিবর্তন ঘটছে, কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তনের মাধ্যমেই জীবের পরিবর্তন ঘটছে। আর তারপর ওয়ালেসের সাথে একসাথে প্রথমবারের মত ব্যাখ্যা করলেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural Selection) প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ঘটে চলেছে এই নিরন্তর পরিবর্তন, যা এখন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমানিত জীববিজ্ঞানের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ন মূল তত্ত্ব [৮]।*

তবে পরবর্তী অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করার আগে আরেকটি ছোট্ট বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। অনেকে মনে করেন, বিবর্তন তত্ত্ব বোধ হয় প্রাণের উৎস নিয়েও কাজ করে। এটি কিন্তু সর্বাংশে সত্য নয়। উৎস নিয়ে আসলে বিবর্তন তত্ত্বের কোন মাথা ব্যথা নেই, এটি কাজ করে মূলতঃ প্রাণের উৎপত্তির পর থেকে কিভাবে তার বিকাশ ঘটেছে তা নিয়ে। যদিও বিজ্ঞান জীবনের উৎস সন্ধানে খুবই তৎপর (যেমন, প্রাণের উৎপত্তির জৈব রাসায়নিক তত্ত্ব, প্যানস্পার্মিয়া ইত্যাদি তত্ত্ব দ্রষ্টব্য), কিন্তু এগুলো কোনটাই বিবর্তন তত্ত্বের মূল বিষয় নয়। যে ভাবেই জীবনের উৎপত্তি ঘটুক না কেন, সেটি কি

করে পদে পদে বিকশিত হল, বিবর্ধিত হল, উদ্ভব ঘটল নতুন নতুন প্রজাতির - এগুলোই বিবর্তন তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়।

চিত্র ১.৩: ডারউইনের 'অরিজিন অব স্পিসিজ' প্রাণের উৎপত্তি' নিয়ে কাজ করে না

(সৌজন্য : http://evolution.berkeley.edu/evosite/misconceps/IAorigintheory.shtml)

তথ্যসূত্র:

১. Villagers speak of the small, hairy Ebu Gogo, 2004,
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2004/10/28/whuman228.xml&sSheet=/news/2004/10/28/ixnewstop.html

২. Q&A : Indonesian hominid find, BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3960001.stm

Flores Man, Nature online news,
http://www.nature.com/news/specials/flores/index.html

'Hobbit' joins human family tree, BBC News,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3948165.stm

Moris D, Eton or the zoo? BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3964579.stm

৩. Rincon P, Neanderthals not close family, BBC News, 2004,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/3431609.stm

৪. The National Academies Press (NAP), Teaching about Evolution and the Nature Of Science, http://www.nap.edu/readingroom/books/evolution98/evol1.html

৫. Stringer, C and Andrews P, 2005, The Complete World of Human Evolution. Thames and Hudson, New York, USA.

৬. Russell S, 2001, Of Mice and Men: Striking similarities at the DNA level could aid research, San fransisco Chornicle, http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2002/12/05/MN153329.DTL&type=science

৭ Stenger, VJ, 2003, Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Prometheus Books, New York, USA

৮. Dawkins R, Darwin and Darwinism, Mukto-Mona Darwin Day celebration, http://www.mukto-mona.com/Articles/dawkins/darwin_and_darwinism120206.htm

৯ রায় অ, ২০০৫, আইডি নিয়ে কূটকচালি, পড়শী মাসিক পত্রিকা (মুক্ত-মনায় পুনঃপ্রকাশিত) http://www.mukto-mona.com/Articles/avijit/porshi/id_porshi.pdf

দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য

{বন্যা আহমেদের *বিবর্তনের পথ ধরে* বইটি অবসর প্রকাশনী থেকে ২০০৭ এর একুশে বইমেলায় প্রকাশিতব্য। এই অংশটি বইটির প্রথম অধ্যায়।}